চতুর্থ অধ্যায়

আন্দোলন ও সংগ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

আন্দোলন-সংগ্রাম-বিদ্রোহে বাংলাদেশের এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। শোষণ, জুলুম আর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ বিদ্রোহ করেছে বহুবার। সংগ্রাম-আন্দোলনে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের অধিকার আদায় বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে-সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ, প্রভৃতি। এমনকি ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা আন্দোলন এবং এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। এখানে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- উপনিবেশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারব ;
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধে সমতলের এবং পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হব এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অবদান জানতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারী ও খেতাবপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হব এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকজনের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ০১: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর পাকিস্তানি শাসকগণ বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে থাকে। ভাষা, সংস্কৃতির উপর পাকিস্তানিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন থেকে উন্মেষ ঘটে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভূ-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে একরকম বৈরী পরিবেশে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়।

ইংরেজ রাজত্বের দু'শো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে কৃষকরাই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের কৃষকদের বিদ্রোহগুলি এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২৪ পরগনা জেলায় তিতুমীর বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল চাষিদের বিদ্রোহ, ১৭৭৯ সালের চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে খাসি বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালের নাগা বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে ছিল কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। আমরা দেখি ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি শাসন-শোষণ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও মূল জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মণিপুরী, মান্দি, খাসি, কোচ, হাজং, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, মাহালীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সবারই কমবেশি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইতিহাসে এদের অহংকারদীপ্ত এসব সংগ্রামের নানা নামও রয়েছে। যেমন— সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন প্রভৃতি। এমনকি তেভাগা আন্দোলনেও উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ সরাসরি অংশ নিয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই বীরনায়ক ভ্রাতৃদ্বয় সিধু ও কানু, মুন্ডা বিদ্রোহের মহানায়ক বীরসা মুন্ডা, টংক আন্দোলনের খ্যাতিমান নারী কুমুদিনী হাজংসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক বীর নারী-পুরুষ ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। আর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা নির্যাতিতও হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ সবারই দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অসামান্য অবদান রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ইংরেজদের দুশো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রথম কারা বিদ্রোহ করে?
কাজ- ২:	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্রিটিশ বিরোধী পাঁচটি আন্দোলনের নাম উল্লেখ করো।

পাঠ- ০২: সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল একবার নয় বারবার। ১৭৮০-১৭৮৫ সালে তিলকা মাঝির (মুরমু) নেতৃত্বে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের ভীত কেঁপে উঠেছিল। পরে আবার ১৮৫৫, ১৮৭১, ১৮৭৪, ১৮৮০-১৮৮১ এবং ১৯৩৩ সালে জিতু ও সামুর বিদ্রোহ হয়। এ সকল বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে। সাঁওতালরা অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে দামিন-ই-কো নামে যে জনপদটি গড়ে তুলেছিল (বর্তমান ভারতে), সে জনপদ একদিন আর তাদের নিজস্ব রইল না। সে জীবনে ঢুকে গিয়েছিল ইংরেজ দারোগা, দেশি মহাজন ও লোভী ব্যবসায়ী শ্রেণি। এই অর্থলোভী গোষ্ঠী সাঁওতাল পরগনা থেকে বিপুল পরিমাণ ধান, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরে কলকাতায় চালান দিতো। সেখান থেকে এ দ্রব্য সামগ্রী ইংল্যান্ডে রফতানি করা হতো। এ দ্রব্য সামগ্রীর জন্য ব্যবসায়ীগণ সাঁওতালদের সামান্য পরিমাণ অর্থ, লবণ, তামাক অথবা কাপড়-চোপড় দিত। এভাবে মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির শোষণ ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সাঁওতালদের অভাবের সময়ে কিছু অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করেই মহাজন শ্রেণি সাঁওতালদের সারা জীবনের জন্য দাস হিসাবে কিনে নিত। মহাজনেরা সাঁওতালদের মধ্যে ঋণের কারবার চালু করেছিল। এ ঋণের সুদের কোনো নির্দিষ্ট হার ছিল না। একজন সাঁওতালকে তার ঋণের জন্য তার জমির ফসল, হালের বলদ, এমনকি নিজেকে এবং তার পরিবারকেও হারাতে হতো। আর সেই ঋণের দশগুণ পরিশোধ করলেও তার ঋণের বোঝা পূর্বে যা ছিল পরেও তাই থাকত। সহজ-সরল সাঁওতালগণ এসব বহিরাগত লোভী মানুষকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হতো। তাছাড়া মহাজনদের দেওয়া ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ করার সামর্থ্যও অধিকাংশ সাঁওতালদের ছিল না। এর ফলে ঋণ গ্রহণের পরদিনই অনেক সাঁওতালকে সপরিবারে মহাজনের বাড়িতে দাসত্ব করতে যেতে হতো। তাদের এ জীবনে ঋণ আর কোনোদিনই শোধ হতো না। মৃত্যুর সময় তারা তাদের বংশধরদের জন্য রেখে যেত বিশাল ঋণের বোঝা। এই অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য একদিন সাঁওতালরা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সাঁওতাল পরগনার ভগনাডিহি গ্রামে সাঁওতালরা সমাবেশ করে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়। এই সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছিল দুই সাঁওতাল সহোদর সিধু ও কানু। তারা সেদিন দাবি আদায়ের জন্য কলকাতা অভিমুখে পদযাত্রা করেছিল। ক্রমে ক্রমে কানু ও সিধু দুই ভাই সাঁওতাল জাতির মুক্তিদাতা রূপে আর্বিভূত হলেন। তারা গ্রামে জানিয়ে দিলেন তাদের বিদ্রোহের কথা, ভগবানের নির্দেশের কথা। তীর-ধনুক নিয়ে এই প্রতিবাদ পদযাত্রায় সেদিন হাজির হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল। এরপর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা সাঁওতাল এলাকায়। সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে খুন করে বাঙালি মহাজন, দারোগাসহ সুদখোর ব্যবসায়ীদের। ব্রিটিশ সরকার তখন এই বিদ্রোহ দমন করতে তার সকল অস্ত্র গোলাবারুদ ও সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় মুর্শিদাবাদ থেকে ৫০০ অশ্বারোহী, ৪০টি হাতি ও ২টি কামান পাঠানো হয়। প্রথম দিকে যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে। তখন সাঁওতাল অধ্যুষিত বিস্তৃর্ণ এলাকায় সাঁওতালদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বর্ষাকাল চলে গেলে নতুন গোলা-বারুদ ও শক্তি নিয়ে আবার আক্রমণ চালায়। সাঁওতালরা

পাহাড়ে আর সরকারি সৈন্যরা সমতলে। চতুর ইংরেজ বাহিনী বুঝতে পারে পাহাড়ে কামান-বন্দুক কাজে আসবে না তাই তারা বিদ্রোহীদের সমতলে নামিয়ে আনার ফাঁদ পাতে আর সে ফাঁদে ধরা দিয়ে সাঁওতালরা নিচে নেমে এলে চারদিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালায়। দেবতার আশীর্বাদে বন্দুকের গুলি গায়ে লাগবে না এই বিশ্বাসে সাঁওতালরা এগিয়ে এসে মারা পড়তে থাকে। শেষে যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হয়। প্রায় বিশ হাজার সাঁওতাল মৃত্যুবরণ করে। আহত ও বন্দি হয় সাঁওতাল নেতা সিধু ও কানু। মূলত ইংরেজ সৈন্যদের রণকৌশল এবং বন্দুক-কামানের কাছে পরাজিত হয় সাঁওতালরা। এভাবেই সাঁওতালদের স্বাধীনতার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	কোন সময় প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল ? কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?
কাজ- ২:	১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা ছিলেন ?

পাঠ- ০৩: মুন্ডা বিদ্রোহ

ঐতিহাসিক মুন্ডা বিদ্রোহ উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে স্মরণীয়। এই বিদ্রোহ বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে শুরু হয়, যিনি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিরসা ১৮৭৫ সালের এক মুন্ডা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মিশন পরিচালিত স্কুলে সামান্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষিত করার জন্য কোনো স্কুল ছিল না। কারণ তারা মনে করত নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষিত হওয়া উচিত নয়। মুন্ডা জনগণ বিরসাকে ভগবান হিসাবে গণ্য করত। যদিও তিনি সাধারণ মুন্ডাদের মতো বঞ্চনা, ক্ষুধা, অপুষ্টির শিকার ছিলেন। বিরসার যুদ্ধ শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল ভারতীয় মহাজন, পুরোহিত, ভূ-স্বামী, চা বাগান মালিক–যারা ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করত তাদের বিরুদ্ধে। বিরসা সিদ্ধান্ত নিলেন সুশাসন ও নীতির ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীদের জন্য একটা রাজ্য গঠন করবেন এবং ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে নৃগোষ্ঠীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন। ১৮৯৯-১৯০০ সালে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ভারতের রাঁচির দক্ষিণ অঞ্চলে এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। দুই বছর কারাবাসের পর ১৮৯৭ সালে মুন্ডা ছাড়া পেয়ে জায়গীরদার ঠিকাদারদের শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে একটি প্রবল বিদ্রোহ বা "উলগুলান" এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মূলত হারানো জমির অধিকার ফিরে পেতেই এ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সিংভুম, তামার এবং বাসিয়ার মধ্যে যত সরকারি অফিস, পুলিশ স্টেশন, মিশন হাউস ছিল সেখানে বিরসা ও তার অনুসারীরা তীরের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে তীর ছুড়ে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সরকারি বাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেন নি। ৯ই জানুয়ারি ১৯০০ সালে তিনি গ্রেফতার হন। কিছুদিন পর রাচি কারাগারে বিরসার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। বিরসা মুন্ডা মারা গেলেও মুন্ডাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেমে থাকেনি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথম মুন্ডা বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?
কাজ- ২:	বিরসার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল কত সালে এবং কোথায়?

পাঠ- ০৪: হাজং বিদ্রোহ ও টংক আন্দোলন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংদের রয়েছে গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের ইতিহাস। বিভিন্ন সময় তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদেশের হাজংদের ভূমিকা ছিল খুবই উজ্জ্বল। রাজা বিদ্রোহ, হাতিখেদা আন্দোলন, কৃষক-বিদ্রোহ, টংক-আন্দোলন এমনকি দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধেও হাজংদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদান উল্লেখযোগ্য।

হাতিখেদা আন্দোলন: হাজং সম্প্রদায় সরল জ্ঞানে জমিদারদের একসময় দেবতুল্য ভাগ্যবিধাতা রূপে বিবেচনা করত। জমিদারদের সকল কাজেই তারা সহযোগিতা করত। এ সুযোগে জমিদাররা হাজংদের বেগার খাটিয়ে বড় অংকের অর্থ আয়ের পথ সৃষ্টি করে নিত। জমিদারের নির্দেশে হাতি ধরার মতো কঠিন কাজ করার শর্তে কিছু জমি তারা লাভ করত। জীবন বাজি রেখে হাতি ধরার মতো কঠিন কাজ করে যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তারা এক সময়ে এ কাজে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে এভাবেই ১৮৭৩ সালে হাজংরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ক্রমে তারা হাতি ধরার কাজে অস্বীকৃতি জানিয়ে অন্য কাজে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলে জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে হাজংদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। পরবর্তীকালে ১৮৯৩ সালে মনা সর্দার নামে একজন হাজং নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। তারা আর হাতি ধরার কাজে অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দেয়। অপরদিকে জমিদারদের অত্যাচারে পূর্ব থেকেই বিক্ষুব্ধ মান্দি চাষিরাও হাজংদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। মান্দি ও হাজংদের সম্মিলিত বিদ্রোহ যখন তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে, তখনই জমিদাররা হাজং নেতা মনা সর্দারকে হাতির পায়ের তলায় পিষে নির্মমভাবে হত্যা করে।

টংক আন্দোলন: টংক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কৃষক আন্দোলন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ছিল এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি। টংক মানে 'ধান কড়ারি খাজনা'। টংক প্রথার শর্তানুসারে জমিতে ফসল হোক বা না হোক চুক্তি অনুযায়ী টংকের ধান জমির মালিককে দিতেই হতো। ফলে কোনো বছর যদি জমিতে ফসল না হয় বা কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবুও কৃষককে তার নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ করতে হতো। এতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রান্তিক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পড়ে যেত। কোনো কারণে টংকের ধান পরিশোধ করতে না পারলেই কৃষকদের উপর নেমে আসতো অত্যাচার ও নিপীড়ন।

কৃষকরা ধানের হিসাবে তাদের জমির খাজনা শোধ করত। চুক্তি অনুযায়ী ১.২৫ (সোয়া) একর জমির জন্য ১০ থেকে ১৫ মন ধান দিতে হতো যা টাকার হিসাবে দ্বিগুণেরও বেশি। এ চুক্তি গারো পাহাড় অঞ্চলে টংক প্রথা নামে পরিচিত। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তর কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। অথচ ঐ সময়ে জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা। আর ঐ ধানের দাম ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা মাত্র। ফলে প্রতিসোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হতো পনেরো টাকা থেকে প্রায় বিশ টাকা। এই প্রথায় শুধু জমিদারই লাভবান হতো তা নয়, মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও লাভবান হতো।

টংক প্রথা কৃষকদের জন্য ছিল অভিশাপ। হাজংরা এই অভিশপ্ত প্রথার হাত থেকে মুক্তি পেতে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে টংকের কুফল বিষয়ে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করা হয়। পরে ঐক্যমত সৃষ্টি হলে কৃষকরা জমিদারদের টংক ধান দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এতে টংক চাষিদের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ নেমে আসে। কেননা জমিদারগোষ্ঠী টংক ধান আদায়ের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। মূলত হাজং কৃষকরাই টংক উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে তাদের আন্দোলন করতে হয় জমিদারগোষ্ঠীর সাথে। পরে ব্রিটিশ সরকারের সাথে এবং শেষে পাকিস্তান সরকারের সাথেও এ নিয়ে সংঘর্ষ হয়। হাজংদের এ টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড মণি সিংহ।

টংকের অত্যাচারের যন্ত্রণা এবং মুক্তির বাসনা শুধু হাজং নয়, মুসলমানসহ সকল শ্রেণির লোকদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর হাত থেকে রক্ষার উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন হাজং কৃষকরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এজন্য টংক আন্দোলন হাজং আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন সব হাজংদের উপরই নেমে আসে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে টংক আন্দোলন প্রথম দানা বাঁধতে শুরু করে দশাল গ্রামে। পরে সেই আন্দোলনের প্রবাহ কিছু কালের মধ্যেই তড়িৎ গতিতে হাজং অঞ্চলগুলোতে বিস্তার লাভ করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটে। প্রথম দিকে কমরেড মণি সিংহ একাই কৃষকদের মাঝে কাজ করতে থাকেন। পরে আরও কয়েকজন কর্মী এসে যোগ দেন। যেমন–ভূপেন ভট্টাচার্য, প্রমথ গুপ্ত, জলধর পাল প্রমুখ। তাছাড়া রবি নিয়োগী, পুলিন বকসী, আলতাব আলী বিভিন্ন সময়ে তাকে কাজে সহযোগিতা করেন।

এ সময় হাজং কৃষকদের মধ্যে সচেতন ও সক্রিয় সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সম্মেলন। মণি সিংহ-এর নেতৃত্বে কয়েক শত হাজং কৃষক যোগদান করে এই সম্মেলনে। পরে

সুসং দুর্গাপুর হাইস্কুল মাঠে টংক প্রথা উচ্ছেদের জন্য পুনরায় আন্দোলনের প্রস্তুতি সভা করার পরেই সরকারের কড়া নজর তাদের উপর পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১ জানুয়ারি দুর্গাপুরের বিরিশিরিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এ সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে বিদ্রোহী হাজং কৃষকসহ অন্যান্য কৃষককে খুঁজতে শুরু করে। পুলিশ বহেরাতলী গ্রামে তল্লাশি চালায়। অবশেষে এ গ্রামে কাউকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত পুলিশ বাহিনী লংকেশ্বর হাজং-এর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী হাজংকে ধরে নিয়ে বিরিশিরি ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়। হাজং গ্রামগুলোতে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে শতাধিক হাজং নারী-পুরুষ সশস্ত্র বাহিনীর পথরোধ করে। এ সময় বিপ্লবী রাশিমণি হাজং তাঁর দলবলসহ কুমুদিনী হাজংকে বাঁচাতে পুলিশ বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ বাহিনীও নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে এক সময় রাশিমণি হাজং গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত হাজং পুরুষদের বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বাহিনীর দুজন পুলিশ নিহত হয়। অন্যরা কুমুদিনী হাজংকে ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। একজন নারী হয়ে অন্য একজন নারীকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিয়ে রাশিমণি হাজং হাজংদের আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

পাঠ- ০৫: তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন কৃষি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে সংগঠিত বর্গাচাষিদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে সকল নৃগোষ্ঠীর চাষিরাই অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভূমিমালিক এবং ভাগচাষিদের মধ্যে উৎপাদিত শস্য সমান দুইভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৬ সালে আমন ধান উৎপাদনের সময়কালে বাংলার উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের ভাগচাষিরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল কাটতে নিজেরাই মাঠে নামেন এবং তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন। দুটি কারণে এটি বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত। প্রথমত, তারা দাবি করে যে, অর্ধেক ভাগাভাগির পদ্ধতি অন্যায়। উৎপাদনে যাবতীয় শ্রম এবং অন্যান্য বিনিয়োগ করে বর্গাচাষি; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম এবং অবকাঠামোতে ভূমিমালিকের অংশগ্রহণ থাকে অতিনগণ্য। এ কারণে, মালিকরা পাবেন ফসলের অর্ধেক নয় বরং এক-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয়ত, বর্গাচাষিরা দাবি করেন যে উৎপাদিত শস্যের সংগ্রহ মালিকদের কাছে নয় বরং থাকবে বর্গাচাষিদের বাড়িতে এবং ভূমিমালিক খড়ের কোনো ভাগ পাবেন না।

আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চব্বিশ পরগনা জেলায়। ভূমিমালিকরা ভাগচাষিদের এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তারা পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের অনেককে গ্রেফতার করে এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু জমিদারদের দমন-পীড়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তেভাগা আন্দোলনের অগ্রবর্তী ধাপ হিসাবে কৃষকরা কোনো কোনো

এলাকাকে তেভাগা এলাকা বা ভূস্বামী মুক্ত ভূমি হিসাবে ঘোষণা করে এবং তেভাগা কমিটি স্থানীয়ভাবে সেসব এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তেভাগা আন্দোলনের চাপে অনেক ভূস্বামী তেভাগা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং তাদের সাথে আপস করেন।

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কিংবদন্তী হলেন নাচোলের রানীমা ইলামিত্র। জমিদার-জোতদারদের হাত থেকে বাঁচতে ১৯৩৬ সালে প্রথম গঠিত হয় সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি। তারপর ১৯৪০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাষীদের দেওয়ার পক্ষে কৃষক সমাজ আস্তে আস্তে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তখনই ইলামিত্র এই আন্দোলনে শরিক হোন এবং অল্প দিনেই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন পুলিশ ঠাকুরগাঁয়ে তেভাগা আন্দোলনের নেতা ডোমা সিং কে গ্রেফতার করতে গেলে শত-শত কৃষক তা প্রতিরোধ করে। এসময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সফরচাঁদ, মুকুটসিংহ ও নেনদেনিসিংহ। পুলিশের নির্যাতন-নিপীড়নে আন্দোলন যখন কিছুটা ভাটা পড়ে যায় তখনই এগিয়ে আসে নাচোলের রাণী ইলামিত্র। তিনি অল্প দিনেই সবার কাছে রাণী মা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথম হাজং বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?
কাজ- ২:	টংক আন্দোলন কী? এটি কাদের আন্দোলন ছিল?

পাঠ- ৬ ও ৭ : ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সে আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদানও কম নয়। তারাও ছোট ছোট শহরে মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করেছে।

১৯৫২ সালে বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের সময় বীরকুমার তঞ্চঙ্গা দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এ সময় তিনি অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠিত করে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' এই শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিল করেন। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা ভাষার দাবিতে মিছিল ও শ্লোগানে অংশগ্রহণ করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরী যুব-ছাত্ররা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় অংশ নিয়েছিল।

১৯৭১- এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা দেশকে হানাদার মুক্ত করতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। সেসময় অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সম্পদ লুঠ থেকে শুরু করে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতাল: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালসহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনায় তারা লড়েছে প্রতিটি মুক্তির সংগ্রামে। দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালরা রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। সাঁওতাল নারীরাও সেদিন পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে ওরাঁও: মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওরাঁও সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল ও নিয়ামতপুর এলাকায় শত শত ওরাঁও যুবক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার টুকিয়াপাড়ার কাশিনাথ টপ্প, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার মোকিম ওরাঁও, গণেশ ওরাঁও অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বেলপুরের শ্রীচরণ ওরাঁওসহ অনেকে। অন্যদিকে ওরাঁওরা রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে কখনো পৃথক কখনো বা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলেমিশে যুদ্ধ করেছে। রংপুরের বলদি পুকুর ও আশপাশের এলাকা থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধা বুদু ওরাঁওয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণ করে। যুদ্ধে অনেক ওরাঁও মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে চাকমা: পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের সাথে ছয় দফা দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলও আন্দোলিত হয়েছিল। সে সময় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো চাকমা ছাত্র-যুব সমাজ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও দোকানপাট, রাস্তা-ঘাট অচল করে দিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করে। সেসময় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি চাকমা তরুণ-যুবকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কোকনদাক্ষ রায়ও (রাজা ত্রিদিব রায়ের চাচা) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিলেন। এ সময় কয়েকশ চাকমাসহ অন্যান্য জাতির

ছাত্র-যুবকও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ চাকমাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যারা ছিল, তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে রমণী রঞ্জন চাকমা রামগড় সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহিদ হন। সিপাহি মেহরঞ্জন চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। তখন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে চাকরিরত এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে অন্যতম বিমলেশ্বর দেওয়ান ও ত্রিপুরা কান্ত চাকমাসহ ২০/২২ জন ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে কৃপাসুখ চাকমা ও আনন্দ বাঁশি চাকমা অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীরও ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষত বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার হিসাবে নেতৃত্ব দেন হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা। কোম্পানী কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট তৎকালীন মহকুমা সদর রামগড়ের পাকিস্তানি বাহিনীর সদর দপ্তরে আক্রমণ করেন। তারা আবার ১০ সেপ্টেম্বর মানিকছড়ি উপজেলায় পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরেকটি গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেন। হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা এই মানিকছড়ি এলাকায় বেশ কয়েকবার পাকিস্তানি বাহিনীর উপর অভিযান চালান এবং একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৩ জন পাকিস্তানি হানাদার সদস্যকে হত্যা করেন। মুক্তিযুদ্ধে রঞ্জিত ত্রিপুরা, রণবিক্রম ত্রিপুরাসহ ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর আরও অনেক লোক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বরেন ত্রিপুরা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তঞ্চঙ্গা: ১৯৭১ সালে কালামন তঞ্চঙ্গা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বান্দরবানে শহিদ হন। বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হলে, পাকিস্তানি সৈন্য ও পাকিস্তানি পাঠানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ বাঙালি দেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু নর-নারী ভারতের পূর্বাঞ্চল মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় লাভের লক্ষ্যে রাজস্থলি বান্দরবান, রাইংখ্যং বনাঞ্চল অতিক্রম করে। তঞ্চঙ্গারা এসব অসহায় শরণার্থীদের খাদ্য-দ্রব্য ও আশ্রয় দেন এবং তাদের পথ প্রদর্শন করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে বান্দরবানের একজন প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান অনিল তঞ্চঙ্গা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে মারমা: কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলার বাসিন্দা সিংহাই মাং, আবিও, মংছিয়েন ও আক্যমং প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এদের মধ্যে মংছিয়েন শহিদ হন। কক্সবাজার ও পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে ৮ ডিসেম্বর শহিদ হন। তাঁকে মহেশখালি দ্বীপেই সমাহিত করা হয়। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর।

মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরী: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মণিপুরী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর মণিপুরী সমাজে আওয়ামী লীগের সমর্থক কর্মী-নেতারা দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে বিষয়ে দলের উর্ধ্বতন নেতাকর্মীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। তাছাড়া তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমার (বর্তমানে জেলা) কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কুলাউড়া, সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, হবিগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) চুনারুঘাট প্রভৃতি মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকায় মণিপুরীরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করে এবং শরণার্থীদের নিরাপদে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেতে সহায়তা করে।

ভানুবিল মণিপুরী গ্রামের সরকারি চাকুরে কৃষ্ণকুমার সিংহ বিয়ানীবাজার সীমান্ত পার হয়ে ভারত গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শ্রীমঙ্গল কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র তিলকপুর গ্রামের সতীশচন্দ্র সিংহ শ্রীমঙ্গল শহরে পাকিস্তানিদের আস্তানা তৈরির পরদিনই ত্রিপুরায় পৌঁছে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নীলকান্ত সিংহ মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং হাকালুকি হাওরে পাকিস্তানি সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখেন। গিরীন্দ্র সিংহ মুক্তিবাহিনীর গাইড হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং শহিদ হন। রবীন্দ্রকুমার সিংহ, এম সি কলেজের গণিত অনার্সের ছাত্র ছিলেন। তিনিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরকম অনেক মণিপুরী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শরণার্থী শিবিরে মণিপুরী গানের শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন সিংহ, অনিতা রানি প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধে খাসি: মুক্তিযুদ্ধে খাসিদের অবদান নিয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। লোকমুখে জানা যায় যে, খাসিরা সীমান্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ও খবরা-খবর আদান প্রদানে সাহায্য সহযোগিতা করত। তবে ইয়নিস খাসির মতো কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম সেরা নারী যোদ্ধাদের মধ্যে কাকন বিবি ছিলেন খাসি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তার প্রকৃত নাম কাকেউ নিয়তা।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছিল?
কাজ- ২:	মণিপুরী শিল্পীদের মধ্যে শরণার্থী শিবিরে গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন কে কে?
কাজ- ৩:	রংপুর সেনানিবাস কারা আক্রমণ করেছিল? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?

পাঠ-৮ : মুক্তিযুদ্ধে কাকন বিবির বীরত্বপূর্ণ অবদান

দেখতে অনেকটা বাঙালির মতো হলেও কাকন বিবি ছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তাই যুদ্ধের সময় এক পাকিস্তানি মেজর তাঁকে দেখেই বলেছিলেন, 'ওকে-তো দেখে বাঙালি মনে হয় না, মনে হয় অন্য জাত'। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙালি নন, খাসি নারী। এক খাসি পরিবারে জন্ম এই মহিয়সী নারীর। মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের দোয়ারাবাজারের কাকেট নামে এক মহিলার অবদানের কথা জানা যায়, তিনি সেই কাকন বিবি। এলাকায় তিনি পরিচিত 'খাসি মুক্তিবেটি' হিসাবে। অর্থাৎ জাতিগত পরিচয়ের বাইরে মানুষ হিসাবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এই উজ্জ্বল তাঁরার পরিচয় পেয়েছি আমরা অনেক পরে।

মাতৃসূত্রীয় খাসি পরিবারে জন্ম কাকনের। খাসি নাম কাকেউ নিয়তা। তিনি ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের সীমান্তের কাছে নওত্রই গ্রামে অবস্থাসম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট কাকেউ। মাতৃগর্ভে তিনি হারান বাবাকে। আর দেড় বছর পরে মাকে হারিয়ে তাঁর আশ্রয় হয় নানীর কাছে। নানীর কাছ থেকে চলে আসেন বড় বোনের আশ্রয়ে। শৈশবে পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন এবং সকলের ছোট বলেই ভাইবোনদের আদরটা তিনি বেশি পেয়েছেন। পরিবারে কোনো অভাব অনটন ছিল না। তাঁর বড় বোন কাপল নিয়তা আনসার বাহিনীতে কর্মরত এক মুসলমান কমান্ডারকে বিয়ে করেন। তিনি বড় বোনের সঙ্গেই কাতলবাড়ি থাকতে শুরু করেন। সেখানেই শৈশব এবং কৈশোরের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। হঠাৎ করেই বড় বোনের উৎসাহে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম হয়ে যান। তাঁর নতুন নাম হয় 'নুরজাহান'। এরপর আবার ফিরে আসেন সুনামগঞ্জে। বিয়ে করেন বাংলাবাজারের ছেলে শহীদউদ্দিনকে। পরপর কয়েকটি সন্তান মারা যাবার পর আরেকটি সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় তাঁকে তালাক দেয় শহীদউদ্দিন। পরবর্তীকালে বোনের স্বামীর উদ্যোগে কাকন বিবি বোগলা ক্যাম্পের সীমান্ত রক্ষী পাকিস্তানের বাসিন্দা আব্দুল মজিদ খানকে বিয়ে করেন। এর কিছুদিন পরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কাকন বিবির স্বামী অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে সিলেটের আকালিয়া ক্যাম্পে চলে গেলে কাকন বিবি বোগলা ক্যাম্পে একা হয়ে পড়েন। শুরু করেন স্বামীকে খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে একদিন কাকন বিবি ধরা পড়েন রাজাকারদের হাতে। রাজাকাররা তাঁকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে টেংরা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে পাকিস্তানিরা তাঁকে মুক্তিবাহিনীর চর হিসাবে সন্দেহে করে আবারও অনেক নির্যাতন চালায়। অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় কাকন বিবি ভেবেছিলেন তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন না। ক্যাম্পের মেজর বললেন, "তুমি যদি তোমার সত্যিকারের পরিচয় বল তা হলে তুমি বেঁচে যাবে। কাকন বিবি তাকে জানান যে তার স্বামী পাকিস্তানি সৈন্য। তখন পাকিস্তানিরা তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করে এবং তাকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করে। কাকন বিবি প্রথমে ভয়ে ভয়ে রাজি হন। তারা কাকন বিবিকে একটি কাগজ দেয় এবং বলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধরলে যেন এই কাগজ দেখায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ধরলে যেন কাগজের কথা না বলে। পাকিস্তান সেনাক্যাম্পে যাতায়াতের সুবাদে কাকন বিবি বাঙালি নারীদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর কাছে এসে সব খুলে বলেন এবং পাকিস্তানিদের সব খবর মুক্তিবাহিনীকে দেন। এভাবেই তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানিদের গোলাবারুদ লুকিয়ে বের করে এনে নিজে নৌকা চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতেন। মহব্বতপুর যুদ্ধ, কান্দাগাঁয়ের যুদ্ধ, বসরাই

টেংরাটিলার যুদ্ধ, বেটিরগাঁও নুরপুরের যুদ্ধ, দোয়ারাবাজারের যুদ্ধ, টেবলাইয়ের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জে যেদিন মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে কাকন বিবি সর্বক্ষণই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল দক্ষিণদিয়ায়। জঙ্গলের মতো জায়গা সেটি। সেই ক্যাম্পের অবস্থান জেনে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি জড়ো করেন। তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রু ক্যাম্প দখল করার জন্য দুদিক থেকে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা সিলেটের বারকাফন ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়ার সময় কাকন বিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া ছিল যুদ্ধ-কৌশলের একটি অন্যতম দিক। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে কাকন বিবি গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। অমানবিক অত্যাচার হয় তাঁর উপর। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই বীরযোদ্ধা নারীর কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবির প্রকৃত নাম কী?
কাজ- ২:	মুক্তিযুদ্ধে নারী কাকন বিবি কী ভূমিকা রেখেছিলো?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাজং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে?

ক. ভুপেন ভট্টাচার্য খ. কমরেড মনিসিংহ
গ. পঞ্চানন ঠাকুর ঘ. আলতাব আলী

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত —

ক. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য
গ. নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ঘ. জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পারুল তার দাদুর কাছে শুনেছিল যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলারাও পুরুষদের সাথে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এক নারীকে পাকিস্তানিরা টেংরা ক্যাম্পে নির্যাতন করে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

৩. **মুক্তিযোদ্ধা ঐ মহিলার নাম কী?**

ক. কাকন বিবি
খ. তারামন বিবি
গ. ছায়াদেবী
ঘ. ফেরদৌসী বিবি

৪. **দাদুর বর্ণিত নারীর নির্যাতনের কারণ-**

i. স্বাধীনচেতা মনোভাব
ii. দেশের প্রতি ভালোবাসা
iii. পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঘটনা-১ : ময়মনসিংহ এলাকার যুবক শিশির তার জমির মালিকের নির্দেশে জঙ্গল থেকে হাতি ধরে আনত। কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়ায় সে বিদ্রোহী হয়।

ঘটনা-২ : বান্দরবান এলাকার অমর তার উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিককে দিতে বাধ্য হয়। এতে সেও বিদ্রোহী হয়।

৫. **ঘটনা-১ এ কোন বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে?**

ক. হাজং ও গারো
খ. ত্রিপুরা ও গারো
গ. মণিপুরী ও হাজং
ঘ. গারো ও মণিপুরী

৬. **অমর ও শিশিরের বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-**

i. কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠন করা
ii. ন্যায্য মজুরী আদায়
iii. সামন্ত প্রভুদের শোষণ থেকে মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. টিপু টিভিতে প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি দল এক বৃহৎ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করছে। ঐ বৃহৎ শক্তি তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। তাদের উপর এমন ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিত যা বংশপরম্পরায় চলতে থাকতো। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দুই ভাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের প্রতিবাদের মুখে ঐ বিদেশি শক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. ছপাতি নকমা কে ছিলেন?

খ. টংক প্রথা বলতে কী বোঝায়?

গ. টিপুর দেখা প্রামাণ্য চিত্রটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. টিপুর দেখা ঐ প্রামাণ্য চিত্রের দুই ভাইয়ের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

২. সংগীতা সিনহা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর একটি বই পড়েছিল। বই পড়ে সে জানে যে, বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে। ঐ অঞ্চলটা ছিল জমিদারদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। জমিদারের গোমস্তা জনগণের কাছ থেকে রশিদ না দিয়ে খাজনা নেয় এবং পরে খাজনা বকেয়া দেখিয়ে তাদের জমি দখল করে। ঐ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার আদায় করে।

ক. তুলা বিদ্রোহ কী?

খ. বিরসা মুন্ডার পরিচয় দাও।

গ. সংগীতা সিনহার পঠিত বইয়ে যে বিদ্রোহের কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "সংগীতার পঠিত আন্দোলনের সফলতার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই প্রধান"- বিশ্লেষণ করো।